# বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শিবপ্রসাদ রায়

মূল্য ঃ ৩.০০ টাকা

নবরূপে বাংলা
ব্যাকরণ ও রচনা

# মুখবন্ধ

দেশে আবার একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চাই এবং সেটি যে কোনো মুল্যে। তার জন্য দেশের ইতিহাস, আইনকানুন, ছাত্রদের সিলেবাস সব পাল্টানো হচ্ছে এবং হবে। মুসলমানদের জন্য সহস্র প্রকারের সুযোগ-সুবিধা এবং কনসেশন দেওয়া হচ্ছে। আটআনা কেজি চাল, একটাকা কেজি চিনি, এম-এ পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় পড়িয়েও কাশ্মীরে ভারতের রাষ্ট্রপতি এক ইঞ্চি, জমি কিনতে পারবেন না। তাতে নাকি ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে? কাশ্মীর সমস্যার উৎস ৩৭০ ধারা, ওটা উচ্ছেদ করা চলবে না। সব রাজনৈতিকদল-এর পক্ষে। ভারতীয় জনতা পার্টি এর বিরুদ্ধে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক বলে সমস্যা চাপা দিলে এতে সম্প্রীতি থাকবে। রামচন্দ্রের মন্দির ভেঙ্গে বাবর মসজিদ করেছিল, ওটা আর মন্দির করা চলবে না, পুরাতত্ত্ব বিভাগকে দেওয়া যেতে পারে তবু হিন্দুদের হাতে দেওয়া চলবে না, দিলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিঘ্নিত হবে। রামমন্দির নির্মাণ করতে গেলে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করেও মুসলিমদের

প্রীতি অর্জ্জন করতে হবে এটাই প্রায় সব দলের সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ থেকে লাখে লাখে মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এসে দেশ ভরিয়ে দেবে, বলা চলবে না। প্রাণের দায়ে হিন্দু এলে তাদের পুশব্যাক করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিতে হবে, এতে সম্প্রীতি বাড়বে। মন্দিরের সামনে দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মহরমের তাজিয়া সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রসহ মিছিল যাবে কিন্তু মসজিদের সামনে দিয়ে কোনো প্রতিমা নিয়ে যাওয়া চলবে না, গেলে বাজনা বন্ধ করতে হবে। প্রতিমার উপর কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এতে ঐক্য বাড়বে, ধর্মনিরপেক্ষতা মজবুত হবে। নামাজের সময় কীর্ত্তন বন্ধ রাখতে হবে, কীর্ত্তনের সময় আজান বন্ধ থাকলে দাঙ্গা হবে, সম্প্রীতি থাকবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মেয়ে লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা হবে, থানায় হিন্দু মেয়ে আর অভিযুক্ত মুসলিম লেখানো চলবে না, ছেলেমেয়ে বলে লেখাতে হবে। এতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দৃঢ় হবে। এককথায় হিন্দুস্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং সত্যকে সর্বপ্রকারে চাপা দেওয়াটাই এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং হিন্দু মুসলিম মিলনের অ্যাডেসিভ। এই বিকারকে হাসিমুখে মেনে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা আবেদন জানাচ্ছেন ঃ সম্প্রীতি রক্ষার সর্বাধিক দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। তাদের আরো সহিষ্ণু হতে হবে। বাম সরকার হোর্ডিংয়ে লিখছে গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সংখ্যালঘুর অধিকার মেনে নেওয়া। কি আজগুবি তত্ত্ব! তাহলে তো সবচেয়ে কম ভোট যে পেয়েছে তার ক্ষমতায় থাকা উচিত। বেশী লোকের রায় মেনে নেওয়াটা গণতন্ত্র। এটা মুসলমানেরা মানবে না, তাই গণতন্ত্রের শর্তটাই বদল করতে হবে।

হিন্দুর সহিষ্ণুতা কিংবদন্তীতুল্য। তবু তারও একটা সীমা আছে। খুব নরম রবারও টানতে টানতে একটা সময় আসে যখন ছিঁড়ে যায়। তাছাড়া

আরো সহিষ্ণুতা দেখালে সম্প্রীতি ফিরবে ইতিহাস একথা বলে না। বরং ইতিহাসে সর্বনাশের ঘনঘটাই দেখা গেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য কম তোষণ করা হয়নি। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে হিন্দুরাই। অর্থহীন বিজাতীয় খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা ভিক্ষা হিন্দুরাই করেছে। নারায়ণকে অপমান করে দরগার সিন্নী তাঁকে দিয়ে সম্প্রীতি চেয়েছে হিন্দু। এককোপে কাটা মাংস সেদিনও খায়নি এবং আজও খায় না মুসলমানেরা। জবাই করা মাংস বিনা প্রশ্নে খেয়ে সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে শুধু হিন্দুরাই। হানাহানি বন্ধ করার জন্য ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য ঈশ্বর এবং আল্লার কাছে সুমতি প্রার্থনা করেছে হিন্দুরা, মুসলমানদের সুমতি ফেরেনি। এতো সহিষ্ণুতা দেখিয়েও তাদের চিত্ত জয় করা যায়নি। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হত্যা-ধর্ষণ-লুটের মধ্যে দিয়ে ভারত খণ্ডিত হয়েছে। মিনতি, ঔদার্য্য, শ্লোগান, সহিষ্ণুতা এককথায় এইসব অবাস্তবতা একপক্ষের উৎসাহ বৃদ্ধির উপাদান হয়ে ভারত ভাগকে সহজ করেছে। আজ আবার সেই একই চিত্র। একদিকে আগ্রাসন, আস্ফালন, আক্রমণ—অন্যদিকে তোষণ, আত্মসমর্পণ এবং সব চাপা দেবার অপচেষ্টা। দেশের মূল সমাজের আশা-আকাঙক্ষা, ব্যথা-বেদনায় কর্ণপাত না করে শুধু সংখ্যালঘু সমাজের কল্যাণ প্রচেষ্টা দেশ জাতির ধ্বংসসাধন করে। মিলন, ঐক্য, সম্প্রীতি এ পথে আসে না। আসে না বলেই বিশ্বের কোনো দেশ ভারতের মতো সংখ্যালঘুদের নিয়ে মাতামাতি করে না। আর যারা নিজেদের কল্যাণের জন্য একটি রাষ্ট্র কায়েম করে নিয়েছে তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামানো উচিত নয়। তারা কোনো কারণে অস্বস্তি প্রকাশ করলে সীমান্ত পার করে দেওয়াটাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। পাকিস্তান বাংলাদেশ

তাই করে। মুসলিম পদলেহন ক'রে, অর্ধেক ভারত ভাগ ক'রে দেবার পরও দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা জীবিত কেন? বুদ্ধিজীবিদের উচিত এর সঠিক উৎস খুঁজে বের করা। স্বাধীনতার আগেও দেশে এই সমস্যা ছিল। দেশের তাবৎ নেতা, বুদ্ধিজীবিরা আজকের মতোই প্রেসকৃপশান দিয়েছিলেন। শুধু কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন নিদান দিয়েছিলেন। বাংলার গ্রামগঞ্জে ঘোরা শরৎচন্দ্র ছিলেন বাস্তববাদী। তাই তাঁর নিদাও ছিল ভাববাদী নয়, বাস্তববাদী। কিন্তু তাঁর কথা বেশীরভাগ মানুষ শোনেনি, শুনেছিল শুধু দেশের হিন্দু সংগঠনগুলি। তাই বর্তমান ভারতবর্ষে হিন্দু সংগঠনগুলি ছাড়া অন্যেরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের অনিষ্ট সাধন করে চলেছেন। বেতার-দূরদর্শন-সংবাদপত্রে নেতাদের বক্তব্য শুনলে বোঝা যায় দেশে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা একটি গভীর সমস্যা এবং এ নিয়ে তাঁরা ভাবিত। দরদী লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তা করেছিলেন। তারই প্রতিফলন এই রচনা "বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা"। এই অস্থির পরিস্থিতিতে তাঁর এই রচনা অনেক বিভ্রান্তকে আত্মস্থ করবে, সমস্যাটির প্রকৃত সমাধানে আগ্রহী করে তুলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার এই মুখবন্ধটুকু শুধু গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজা করা মাত্র।

তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর<br>১৯৮৯

শিবপ্রসাদ রায়<br>কালনা, বর্ধমান

# বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

কোনো একটা কথা বহু লোক মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গমগম করিতে থাকে,—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে, মানুষ অভিভূতের ন্যায় তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানোই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য এই ক্ষমতাকে সত্য বলিয়া যে দুইপক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল সে তো কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে—বহু নেতাই মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিষটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এই জন্যে যে, এ না হইলে, স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি একথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে এক পাগল ছাড়া আর এতবড়ো পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপরে এই মিলন ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাব নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড়ো দুটা ভূয়া জিনিষও ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবুও বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ কল্যাণের হৌক, অকল্যাণের হৌক, সমবেত একটা ছাড় রফা করিয়া কাউন্সিল ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এতবড়ো অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে

অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেই নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষেরা কি খায়, কি পড়ে, কিরকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কি শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ, অতএব এস একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং এদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতা সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুত এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভর্ত্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এত বড়ো প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালের বড়ো বড়ো মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষু কর্ণ, কেহ বা আর কিছু—হায় রে। এতবড়ো তামাসার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের শেষ চেষ্টা

করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশদিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধহয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না। সে যাত্রা কোনোমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড়ো ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইহার সত্যকার উপকার কিছু করা চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পরাইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও। বস্তুত, মুসলমান যদি কোনদিন বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের 'পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আর মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের

উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে যে, নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্য্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত্তও ইতস্তত করিবে না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বেশি তারতম্য নাই, কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ে তুলনাই হয় না। হিন্দু নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এতবড়ো অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুঝিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে......

মিলন হয় সমানে সমানে, শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না এবং ইহাকে মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় তো সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া প্যাক্ট করিয়া ডান ও বাঁ দুই হাতে মুসলানের পুচ্ছ চুলকাইয়া

স্বরাজ যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে এ দুরাশা দুই একজনের হয়তো ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন, দুঃখ-দুর্দ্দশার মতো শিক্ষক তো আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসীর কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়তো তাহাদের চৈতন্য হইবে। হয় তো হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজ রথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ, যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহার আঁচটুকুও লাগে না, এবং তাহার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানি বাধে না। সুতরাং এ আকাশ-কুসুমের লোভে আত্ম-বঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ। যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিন্তু এই গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাংলার মুসলমানকে একথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে সাতপুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে, সুতরাং রক্ত সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি, জ্ঞাতি বধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে আমার ক্রীশ্চান বন্ধু অনেক আছেন। কাহারও পিতামহ, কেহ বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার যো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই-বোন নন্। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এতবড়ো শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি।

আর মুসলমান? আমাদের এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি সে পর্য্যন্ত এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার যো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে, এমনই বটে। উগ্রতায় পর্য্যন্ত ইহারা বোধহয় কোহাটের (উঃ পঃ সীমা প্রদেশ) মুসলমানকে লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে, হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড়ো সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না,—আত্মার এতবড়ো দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও বন্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়। নিজের কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্যপক্ষ থেকে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য

আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর—আর কাহারও নয়। মুসলমানদের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড়ো সত্য রহিয়াছে যাহা এক-দুই-তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসেবের মধ্যে গণ্য করে না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিষ যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে তো এ লইয়া অহরহ আর্ত্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরও কোনও সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাইনে বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারংবার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে, তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই বলিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি— তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,— এবং এ সকল তোমার ভারী অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত

হইয়া হাহাকার করিতেছি। এসকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক কি কছিু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের আর অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু বস্তুত হওয়া উচিত ছিল ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তা সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জ্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা-কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানদেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড়ো বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎ শুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ। আর দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশশুদ্ধ লোকই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্দ্ধেকের বেশি লোকে ত ইংরেজের পক্ষেই ছিল। আয়ার্লণ্ডের মুক্তিযুদ্ধে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট আজ রাশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে

সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় কাজ বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয় তো একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।

[দৈনিক বসুমতী, ১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩]

# স্বদেশ ও সাহিত্য থেকে সংযোজন

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশংকা দেশের ভারসাম্য নষ্ট হবার আশংকা আজকের নয়, বহুদিনের। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে কতো দুশ্চিন্তাপীড়িত ছিলেন, শরৎচন্দ্রের লেখা এই অংশে তা উদ্ধৃত হলো—

দেশবন্ধু হাসিলেন, বলিলেন আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন? বলিলাম, না। দেশবন্ধু বলিলেন আপনার মুসলমানপ্রীতি অতি প্রসিদ্ধ। ভাবিলাম মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার যো নাই। খ্যাতি এতবড়ো কানে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে। কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে চিরদিনই আমার লজ্জা করে, তাই সবিনয়ে মাথা নত করিলাম।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলিতে পারেন? এর মধ্যে তারা সংখ্যায় ৫০ লক্ষ ছেড়ে গেছে আর দশবছর পরে কি হবে বলুন তো? বলিলাম, ওটা যদিও ঠিক মুসলমান প্রীতির নিদর্শন নয়, অর্থাৎ বছর দশেক পরের কথা কল্পনা করে আপনার মুখ কেমন সাদা হয়ে উঠেছে তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশী তফাৎ মনে হবে না।

তবে সে যাই হোক্ কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিষ নয়। তাহলে চারকোটি ইংরেজ দেড়শো কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে দশের মধ্যে ওদের একটা মর্য্যাদার স্থান করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায় নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচার চলে আসছে তার প্রতিবিধান করুন, ওদিকে সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

---

একথার নির্গলিতার্থ জাতপাতের ঊর্ধ্বে বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ হিন্দুসমাজ চাই। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা সামাজিক অবিচার অস্পৃশ্যতা পণপ্রথার মতো অমানবিক অভ্যাসগুলির সংস্কার চাই। বর্তমান ভারতের হিন্দু সংগঠনগুলি সে কাজ এখন দেশজুড়ে করে চলেছে।
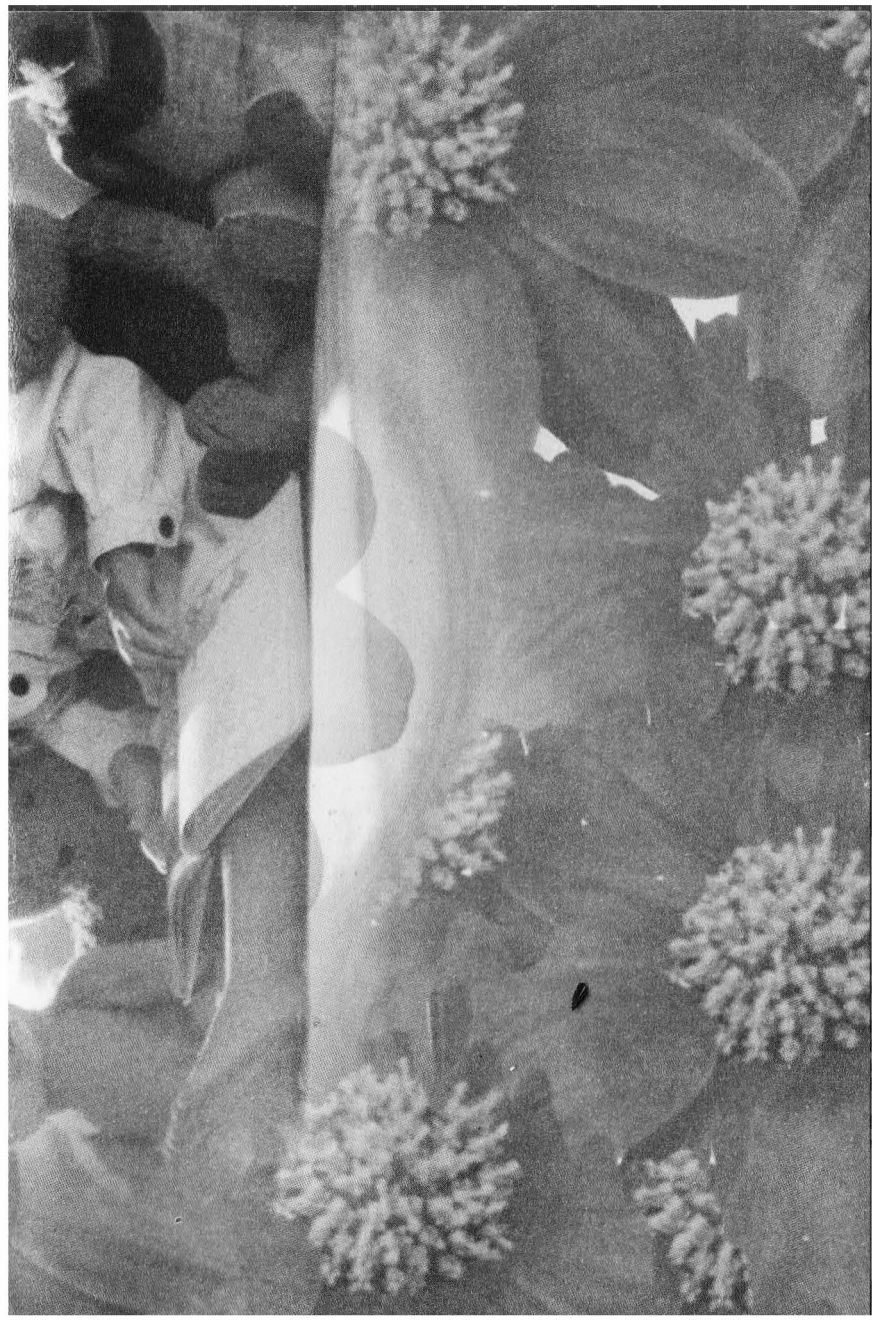
## শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

### লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদ ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।